তখন ও এখন

□□□□ □□□

(১১)

সব উন্নয়নশীল দেশেই সংখ্যালঘু নাগরিক যেন শাপগ্রস্ত। অভিশপ্ত এক গোষ্ঠী। সে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হোক, ভাষাগত সংখ্যালঘু হোক, জাতিগত সংখ্যালঘু হোক বা মতাদর্শগত (যেমন বাংলাদেশের আহমেদিয়া সমম্প্রদায়) সংখ্যালঘু হোক। অনেক পৌরাণিক কাহিনীতে পড়েছি অনেক চরিত্র শাপগ্রস্ত হয়ে পাথর হয়ে গেছে বা জড়াগ্রস্ত হয়েছিল কিংবা অন্য প্রাণীতে পরিণত হয়েছিল। কোন মহৎ প্রাণের ছোঁয়ায় শাপমুক্ত হয়েছে।

আর বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা শাপগ্রস্ত হয়ে পরিণত হয়ে আছে মেরুদন্ডবিহীন এক প্রাণীতে। নিজের অধিকারের কথা বলার জন্য দাঁড়াতে পারে না, হাত তুলতে পারে না। জড়াগ্রস্ত বলে নিজের দাবির কথা বলার মত স্বর নেই। জানি না কোন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ, কোন কাঠামোর সরকার (গণতান্ত্রিক, তত্বাবধায়ক, জাতীয় নাকি অন্য কিছূ) সংখ্যালঘুদের শাপমুক্ত করবে।

জীবনবোধের গভীরতম প্রদেশে আলোড়ন তোলে যে শব্দ এর নাম সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘুর পরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তি এতটাই অসহায় যেন কোন বদ্ধ পাগলের কোলে নিজের শিশু সন্তান দেখলে যে বোধ সে বোধ। পাগল শিশু সন্তানটিকে আছড়ে দিতে পারে আবার নাও পারে। আছড়ে দিলেও আইনে পাগলের কোন বিচার নেই (সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত)। আবার পাগল শিশুটিকে সযত্নে বুকের কাছেও রাখতে পারে।

দেশে সংখ্যাগুরুর হাতে সংখ্যালঘুর নির্যাতনের কোন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, প্রতিকার নেই। তথাকথিত গণতন্ত্রের তলায় পরে নিমিষ হওয়া ছাড়া। পাগলের পাগলামি আর সংখ্যাগরিষ্ঠের হাঁটুর জোর, কব্জির জোর,

মাথার (আক্ষরিক অর্থে) জোর, ভোটের জোর এক মাত্রার ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

কিছু শব্দ যা সংখ্যায় কম জনগোষ্ঠীর আবেগের সাথে, অপমানের সাথে, অত্যাচারের সাথে, সর্বোপরি তাদের প্রতি অবিচারের চিত্র বহন করে। যেমন- মালাওন, পুতুল পূজা, উপজাতি ইত্যাদি।

আমি আমার কর্ম উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাই সেই ১৯৯৭ সাল থেকে। হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের প্রতি, শিশুদের প্রতি অনেক অবহেলা ও বৈষম্যের অনেক উদাহরণ দেখেছি, বহু অভিজ্ঞতার মুখোমুখী হয়েছি। আজ ইদানিংকালের একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ধর্ম একটি আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় এবং আমার পরিদর্শিত বিদ্যালয়সমূহে হিন্দু মুসলিম ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তবে সে তুলনায় হিন্দু শিক্ষক নেই। হয়ত সম্ভবও নয়। সে অন্য এক প্রসঙ্গ।

শ্রেনীর রুটিনে ধর্ম বলতে ইসলামিয়াত । গত ৬ ফেবুরয়ারী/২০০৮ নরসিংদি জেলার শিবপুর উপজেলার পুরুন্দিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে গেছি । রুটিন অনুয়ায়ী ইসলামিয়াত ক্লাস চলছে। হিন্দু ছেলেমেয়েরা ইসলামিয়াত ক্লাসে বসে আছে। চোখের দিকে তাকালেই বুঝা যায় কী অসহায়ত্ব, দুর্বোধ্য ভাষা ও বিষয় বাধ্য হয়ে শোনার যন্ত্রণায় কাতর শিশু। তাদের হিন্দু ধর্ম বইও দেয়া হয়নি। কেন দেয়া হয়নি প্রশ্নের উত্তরে জেনেছি চাহিদা দিয়ে আনা হয়নি। কী অযৌক্তিক উত্তর! নিজে জন্মসূত্রে হিন্দু বলে এ বিষয়ে কথা বলা অন্যরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে ভেবেও এবং আমার চাকরির ধরনটির জন্যও এ বিষয়ে (ধর্মীয় বিষয়ে) উষ্চবাচ্য করা যুক্তিযুক্ত নয় বা অনুমোদন করে না জেনেও জিজ্ঞেস করি --- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন ছাত্রছাত্রীর সব বিষয়ে বই সরবরাহের দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল কি না ? এটা কোন বিশেষ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অবহেলা নয় কি?

সদুত্তর পাইনি।

ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব আমার কাছে নেই, কিন্তু নৈতিকতার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তায় আমার কাছে অপরিসীম। তাছাড়া, আমি দেখেছি রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কতিপয় ধর্মীয় সংখ্যালঘু শিশুদের প্রতি বৈষম্যের চিত্র। এ বৈষম্য তাদের মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বৈকি।

অন্য সময় দেখেছি ইসলামিয়াত ক্লাসে হিন্দু ছাত্রছাত্রীরা হয় বোকার মত বাধ্য হয়ে বসে থাকে, নয়তো তাদের ছুটি দিয়ে দেয়া হয় অথবা তাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয় খেলতে । এ হলো সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার নমুনা। শিক্ষক ইচ্ছে করলে সংখ্যালঘু শিশুদের তাদের ধর্মীয় পাঠ্য বই খুলে নিদেন পক্ষে পড়তে বলতে পারেন । কিন্তু কেউ কিছুই করেন না । কারণ এ বিষয়ে কারো কোন তত্ত্বাবধায়ন --- নির্দেশ বা আদেশ নেই । যাহোক, ধর্মীয় সংখ্যালঘু শিশুদের ইসলামিয়াত ক্লাসে যদি বসিয়ে রেখে ইসলাম ধর্মের মূল বিষয়গুলোও আলোচনা করা হয় তবে যে কোন শিশুর নৈতিকবোধ জাগ্রত হবার কথা। কিন্তু তা করার জন্য কী কেউ দায়িত্ববোধ করে ? রাষ্ট্র যেমন ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে তেমন তা সব ছাত্রছাত্রীর পড়ার সুযোগ করে দেয়াও রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব।

তবে আমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মকে বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয় হিসেবে না রাখার পক্ষে জোর দাবি করছি । শিশুরা বিদ্যালয়ে যাবে মানুষ হিসেবে, শ্রেণীকক্ষে বসে শিক্ষা গ্রহণ করবে মানুষ হিসেবে, ধর্মীয়ভাবে বিভাজিত হয়ে নয়। তবে যে সব বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রছাত্রী বেশি সে সব জেলা শহরের এবং রাজধানীরও গুটি কয়েক বিদ্যালয়ে ধর্ম ক্লাস আলাদা শ্রেণীকক্ষে করার ব্যবস্থা আছে।

ছোট ছোট শিশুদেরকে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান হিসেবে আলাদা শ্রেণীকক্ষে ধর্ম বিষয়টি পড়াতে বসানো মানেই তাদের শিশু মনে বিভাজনের

বীজ রোপন করা। এতে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুত্বের অনুভূতিকে প্রখর করে তোলে। সংখ্যাগুরু শিশু বড় হয় আধিপত্য করার ---- জোর খাটাবার মানসিকতা নিয়ে আর সংখ্যালঘু শিশু বড় হয় দুর্বল ও অসহায় হয়ে --- হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত হয়ে।

আমার ছোটবেলায় ধর্ম ক্লাসের জন্য আলাদা হয়ে বসার সময় প্রিয় বন্ধুদের ছেড়ে যেতে হত মাত্র ত্রিশ বা চল্লিশ মিনিটের জন্য। তখন শিশু মনে কষ্ট হত বৈ কি!কোন জুড়ালো যুক্তি ছাড়াই মনে হত বিদ্যালয়ে ধর্ম না পড়ালে কী হয়? এখন অনেককেই প্রিয় বন্ধু--- প্রিয় জেলা--- প্রিয় দেশ --- ছেড়ে যেতে হচ্ছে ত্রিশ বা চল্লিশ মিনিট নয় --- আজীবনের জন্য। বড়বেলায় মানুষের কষ্ট সহ্যের অসম্ভব শক্তি অর্জিত হয়।

তবে ধর্ম ক্লাসে শিক্ষক ছাড়া বসে আছি বা ইসলামিয়াত ক্লাসে আমাদের বসিয়েছে অথবা ছুটি দিয়ে দেয়া হয়েছে কিংবা বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এমন স্মৃতি নেই।

এখন পাঠ্য বইয়ের বিষয় নির্বাচনও ধর্ম নিরপেক্ষ নয়। যদিও পাকিস্তান আমল তবুও ধর্মীয় পক্ষপাতের উর্ধ্বে উঠা নির্বচিত কিছু গল্প পড়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। যেমন --- ‘কার চিঠি? মায়ের চিঠি। মা লিখিয়াছেন ছোট ভাইয়ের বিবাহ। বাড়ী যাইতে হইবে। কিন্তু ছুটি মিলিল না’। গল্পটি ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি সম্পর্কে। চাকরিতে ছুটি না মিললে যিনি মায়ের ডাকে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঝড়ের রাতে সাঁতরে উত্তাল দামোদর নদী পার হয়ে মায়ের কাছে চলে গিয়েছিলেন। নৈতিক শিক্ষার জন্য সংকলিত হয়েছিল নিশ্চয়ই।

এখন পরিকল্পিতভাবেই পাঠ্য বইয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা, গল্পে অমুসলিম চরিত্রের কথা এড়িয়ে চলা হয়। কুবিবেচিতভাবে --- নেতিবাচকভাবে বিভাজন তৈরির অপচেষ্টা চলছে। এ চলাকে রোধ করার ইচ্ছেই কারও নেই।

গীতা দাস
ঢাকা
২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৫/ ১১ জুন, ২০০৮
grdas2006@yahoo.com